জুলাই বাংলাদেশের আত্মরক্ষার নাম

ফারুক ওয়াসিফ

জুলাই কী অর্জন করলো এটা প্রথম প্রশ্ন নয়। পয়লা জিজ্ঞাসা এটাই যে, কেন বাংলাদেশে এত রক্তের দানে গণহত্যার গিরিখাদ পেরিয়ে জুলাইকে ঘটতে হলো? জুলাই কোনো প্রকল্প নয়, জুলাই বাংলাদেশের আত্মরক্ষার নাম। আত্মরক্ষার অধিকারে জুলাই সৎ ও সত্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বখ্যাত স্প্যানিস শিল্পী পাবলো পিকাসো প্যারিসে থাকতেন। হিটলারের নাজি বাহিনী প্যারিস দখল করার পরে এক নাজি অফিসার একদিন তাঁর ছবি আঁকার স্টুডিওতে ঢুকে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে অফিসারটি দেখে বিশাল ক্যানভ্যাসে স্পেনের ফ্যাসিবাদী গণহত্যার ছবি গুয়ের্নিকার সামনে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, কাজটা (মানে শিল্পকর্মটা) তুমি করেছ? মনের ঘৃণা লুকিয়ে রেখে পিকাসোর চোখা জবাব: না, তোমরা করেছ! শেখ হাসিনার দুঃসহ শাসনও জুলাইয়ের মহা ঐতিহাসিক লড়াই ও শহীদানের জন্ম দিয়েছিল। জুলাই কোনো প্রকল্প নয়, জুলাই ছিল ঘাতকের কবল থেকে দেশ উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা। এবং মরিয়াই বাংলাদেশের তরুণেরা প্রমাণ করলো যে, জীবন দিয়েই দেশ বাঁচাতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পরের সাড়ে তিনটি বছর বাংলাদেশ দুঃশাসন ও নৈরাজ্যে থমকে ছিল। কিন্তু সেটা মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করে নাই, বরং ৫৫ বছর পরে এসে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের বিকল্প ছিল না। জুলাইয়ের পরের অনিশ্চয়তা সে তুলনায় অনেক কম। জুলাই পরবর্তী পুলসিরাত পেরিয়ে অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে, গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে, প্রতিশোধ ঠেকিয়ে বাংলাদেশ যে নির্বাচনি বৈতরণি রেকর্ডরকম শান্তিপূর্ণভাবে পার হয়েছে, সেটা অবশ্যই এক বড়ো সুসংবাদ। জুলাইয়ের বড়ো অর্জন বাংলাদেশ ড্রিমকে ফিরিয়ে আনা। 'যে কেবল পালিয়ে বেড়াত, দৃষ্টি এড়াত, ডাক দিয়ে যেত ইঙ্গিতে'; সেই স্বপ্নকে আবার জাতির সামনে হাজির করা, তাকে সম্ভবযোগ্য করে তোলা। জুলাই-২৪ এর বড়ো অবদান হারানো বাংলাদেশকে আবার সকলের সামনে হাজির করেছে জুলাই-২৪। আমরা সফলতার চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছাইনি বটে, তবে পথ হারাবার ভয় কেটে গিয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় কী?

বাংলাদেশে মানবতার দুঃসহ বাস্তবতাকেও একেবারে উদোম করে দিয়েছে জুলাই। জুলাইয়ের ৩৬ দিনে গুলির নিশানা অনুসরণ করে কী দেখা যায়? আবু সাঈদের ঝাঁঝরা হওয়া বুক, শহীদ ওয়াসিমের প্রবাসী পিতার হাহাকার। গুলির উড়ালপথ ধরে আরও এগিয়ে গেলে আপনি পাবেন, ঘরের ভেতরে মায়ের কোলে গুলবিদ্ধ শহীদ আব্দুল আহাদ (৪)। ছাদে খেলতে যাওয়া রিয়া গোপের (৬) নুপুর পড়া নিথর দেহ। বাবার কোলেই বুলেটে নিহত ২ বছরের রহিত (২)। মায়ের সাথে ৪ তলার বারান্দায় দাঁড়ানো নাঈমা (১৫)। কার্ণিশ ধরে ঝুলতে থাকা আমীর হোসেন, এক গুলিতে নাতি ও দাদির জীবন কেড়ে নেওয়া। আশুলিয়া জীবিত ও মৃত জুলাইযোদ্ধাদের ভ্যানের ভেতর জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা একসাথে লড়াই করতে করতে ২২ জনের ২১ জনকেই হারিয়ে ফেলা তরুণের মানসিক ট্রমা। ছেলেটি জীবিতদের দুনিয়ার চেয়ে বেশিটা সময় কাটায় শহীদ সহযোদ্ধাদের সাথে। এইসব অসম্ভব অসহ্য আবার মহান সব ঘটনা কোনো পরিকল্পনার ফসল না। মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়ে যারা শহীদ হয় তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

এইসব গুলির নিশানা মানসিক বিকারগ্রস্ত একজন পরাস্ত শাসকের প্রতিশোধের ঘৃণা ছাড়া আর কিছু না! কালের কেতুর চোখ থেকে মুছে আমরা সাক্ষ্য দেব, কীভাবে মানবতার ভয়াবহ ধ্বংস ঘটেছিল এই দেশে। আমরা সাক্ষ্য দেব মানুষের জন্য মানুষের অলৌকিক আত্মত্যাগের কিংবদন্তির কথা। বাদশাহ শাদ্দাদের প্রাসাদের তলায় দানবের শিকার হওয়া বাংলাদেশের চিরে ফেলা বুককেও মেলে ধরেছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান। জাতিসংঘ মারফত আয়নাঘর নামের গোপন যক্ষপুরীর সাক্ষি আজ বিশ্ব। কেবল জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময়েই ১৪ শত তাজা প্রাণের শুমার করতে পেরেছে জাতিসংঘ। আরও হিসেব বাকি। গুম কমিশন ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১ হাজার ৫৬৯টি গুমের ঘটনা নিশ্চিত করেছে। অভিযোগ আমলে নিলে সংখ্যাটা ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার পর্যন্ত হতে পারে। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে বিচার ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে ১৯২৬ জনকে (প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর, ২৪)। প্রতিটি সংখ্যা মানে একেকটি নামসংবলিত মানুষ, সেই মানুষের পরিবার, সেই মানুষের না থাকার ফলে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আরও অনেকের জীবন।

একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় জনগণের আমানতের থেকে আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। লুট হয়েছে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংক। লুট হয়েছে প্রিয় বাংলাদেশটাই। জুলুমশাহী আমলের রাজনৈতিক নিপীড়নের রেকর্ড যে কেনো পরাধীন দেশকেও হার মানাবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রায় ৬০ লাখ মামলার আসামি করার কথা বলেছেন দলটির নেতারা। কয়েক প্রজন্মের লাখো তরুণের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশ পতিত হয়েছিল অন্তহীন

বিষাদগ্রস্ততায়। বসবাসের অযোগ্য, চরম বৈষম্যপূর্ণ, নোংরা ও অপরাধে ভরা নগরগুলোতে ক্ষমতাবানেরা গড়ে তুলেছিল নিজস্ব স্বর্গ, নিজস্ব বাহিনী আর গুম-খুনের কয়েদখানা। রাজনীতি হয়ে পড়েছিল মাফিয়া 'লিজেন্ড', খুনি 'গডফাদার', রঙিলা 'আম্মাজান', জমিদার 'বড়ো ভাই', আর সরকারি 'দাবাং' চরিত্রের উর্বর বীজতলা। এভাবে তারা গড়ে তোলে এক অপরাধমুলক রাজনৈতিক অর্থনীতি। এর সহজ নাম ঠগিতন্ত্র। বাংলাদেশে একটা যুগ গেছে, যখন জনগণকে নাই করে দেওয়া হয়েছিল। সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসা শাসককে বদলানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। জনগণ যখন তাদের শাসককে বদলাতে পারে না, তখন শাসকেরাই জনগণকে বদলে দেয় এবং ছোট্ট একটা উমেদার গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে তোলে আগ্রাসী উমেদারতন্ত্র (Clientelism)। দীর্ঘ দুঃশাসন জনগণের মনোবল, নৈতিকশক্তি ও অধিকারবোধ নষ্ট করে দেয়। নদীর মতো তখন মানুষও দূষিত হয়ে যায়। জুলাইয়ের ছাত্রজনতার অবিস্মরণীয় শহীদান এই আজাব থেকে দেশটাকে উদ্ধার করেছিল। শহীদ ও আহত কিশোর-তরুণদের রক্তেধোয়া রাজপথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিখোঁজ জনগণ ফিরে এসেছিল 'ছাত্র-জনতা' হয়ে। অতিকায় আবরাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখির ঘূর্ণিঝড় হয়ে।

জুলাইয়ে রক্তস্নানে বাংলাদেশ শুদ্ধ হয়ে গেছে তা বলবো না, তবে নিজের ঐতিহাসিক কক্ষপথে ফিরবার সুযোগ পেয়েছে এই দুঃখিনী মাতৃভূমি। এমন সুযোগ এক শতাব্দীতে দুয়েকবারই আসে। দুঃখের কথা, আমরা সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। তবে পথের মঞ্জিলে না পৌঁছাতে পারলেও পথ হারাবার ভয় কমে গেছে। সারা বিশ্বে যখন গণতন্ত্র পিছু হঠছে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য অবধি উত্থান ঘটছে কতৃত্ববাদী একনায়কদের, তখন বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের বিজয় গণতন্ত্রের পক্ষে একটা বৈশ্বিক বিজয়ও বটে। এই পথ ধরে নেপাল ও ভারতেও তরুণদের প্রতিরোধী জাগরণ দেখা গিয়েছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি ছিল উঠতি মধ্যবিত্তভুক্ত শহর-নগর-মফস্বলের ছাত্র-তরুণ। এরা বনেদি মধ্যবিত্তের প্রতি হতাশ ও বিরূপ ছিল। এই ছাত্রতরুণদের আরেক কথায় বলা যায় প্রিক্যারিয়েত— জীবন-জীবিকার প্রশ্নে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী। এদের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল শহুরে প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ খেটে খাওয়া রিকশাচালক, মজুর, হকার, গার্মেন্টস ও হোটেল শ্রমিকেরা। একেবারে শেষ দিকে গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা যোগ দিলে গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চরিত্র অর্জন করে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রতিরোধী বাংলাদেশের সার্বজনীনতা। এই এজমালি চরিত্রের কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাস বৈষম্যবিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস। এই দেশে প্রলেতারিয়েতের বা কৃষকের শ্রেণি সংগ্রাম জারি থাকলেও তা ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল না। বরং বারেবারে দেখা গেছে নব্য বড়োলোকের সাথে উঠতি মধ্যবিত্তের শ্রেণি সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্বে জমিদারকুলজাত বনেদিদের সাথে উঠতি মধ্যবিত্ত সন্তানদের দ্বন্দ্বে ১৯৪৭ এর বাংলাভাগ হয়। পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবি এলিটদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে তৈরি হয় ঢাকার উঠতি মধ্যবিত্তের জাতীয় সংগ্রাম। সংগ্রামটা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল শতবর্ষের বৈষম্যের শিকার উঠতি মধ্যবিত্তের আরেক বিজয়। প্রথম প্রজন্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গ্রাম-মফস্বলের সন্তানদের উত্থান। পতন ঘটে দেশবোধ হারিয়ে ফেলা, সমাজ অস্বীকার করা লুটেরা এলিট ও বিদেশমুখী বনেদি বন্দোবস্তের। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নজরকাড়া একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যে ধর্মের বা জাতির বা ভাষার মানুষই হোন না কেন, সন্তানাদি ঘিরে পারিবারিক গঠন, মূল্যবোধ, খাদ্যরুচি, জীবনের স্বপ্ন, পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি-প্রতিবেশী, বিয়ে-শাদির সংস্কৃতি মোটামুটি এক। সবার সাথে সবার কিছু কমন বা এজমালি মিল আছে, একের জীবনে অন্যের অংশগ্রহণ আছে। এমনকি বাংলাদেশিদের মধ্যে বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই মিল গড়ে উঠেছে হাজার বছর ধরে, বিশেষ করে সুলতানী আমলে কৃষি ও বাণিজ্য বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। নয়া আবাদ প্রতিষ্ঠায় হরেক জাতিধর্মের মিলনে। এই মিলনের দুই রূপ: লাল সালু পেঁচানো ডেকচি আর কাঁধে কাঁধে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ ও পূজা, মেলা ও মিছিলে। পীরের দরবারে বা মাজারে এক ডেকচিতে সবার জন্য শিন্নি বা খিচুড়ি রান্না হতো, সেই খাবার উঁচা-নিচা সবাই খেতো। এর মধ্যে সমতার আদল ও আকল দুটাই প্রতিষ্ঠা পেতো।

স্বদেশ মানে এজমালি বাংলাদেশ। এজমালি মানে বহুত্ববাদ না, বরং বহু'র মধ্যেকার অংশীদারি একত্ব। এই এজমালি অংশীদারির বোধই জুলাইয়ে বিভিন্ন মত ও পথের মানুষকে বাংলাদেশপন্থী মানবদুর্গ গড়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছে। জুলাই ফ্যাসিবাদের দর্প চূর্ণ করায় সফল। কিন্তু নতুন বাংলাদেশ গড়বার কাজ এখনো বকেয়া রয়ে গেছে। জুলাইয়ের জীবনের দায়-দেনা শোধ করা অসম্ভব। যারা গিয়েছে অস্তাচলে তারা আর ফিরবে না। তবে সরকারিভাবে কল্যাণমুলক রাষ্ট্রের মডেলে Care বা দরদের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতিহিংসা ও বৈষম্যের নীতি সতর্কভাবে এড়ানো হচ্ছে। বাদবাকি বিষয়ে কী ঘটে তা দেখার জন্য ইতিহাসকে আরও সময় দিতে হবে। তারপরও অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পুরনো বন্দোবস্তের অসাধু ঐক্য ভাঙবার বেলায় খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ময়দানে সংস্কারের বাস্তব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির বদলে অহেতুক মতবাদের ঝান্ডা উড়িয়ে ঐক্যটাকে ভাঙ্গার অপরিণামদর্শীতাও ছিল। এসব করতে করতেই জুলাইয়ে গড়ে ওঠা মাল্টিক্লাস, মাল্টিসেন্ট্রিক জনতার এজমালি ঐতিহাসিক জোট কমজোরি হয়ে পড়ে।

শহীদের শেষ নিঃশ্বাসের বাতাসে আমরা বেঁচে আছি। আমরা কী আমাদের মধ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষাটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না? অঙ্গহানি হয়েছে যাদের তারা সক্ষমদের পায়ে ভর দিতে চায়, দৃষ্টি হারানো হাজারো তরুণ আলোর হদিস পেত চায় যারা নাকি দেখতে পায়। বহু আশার সমাধিতে আশা ও অপেক্ষা দুই বোন অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে শান্তির, সমৃদ্ধির, বৈষম্যহীন বাজার ও বিচারের। শিকারি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ বাগানির যত্ন আর মালির পরিচর্যা চায়। জুলাইয়ের দায়-দেনা ও বকেয়া পরিশোধের সেটাই উপায়।

#

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পিআইডি ফিচার